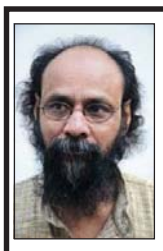

আনন্দ অঙ্গন পত্রিকার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

— জয় গোস্বামী, ৪/৩/১৮

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

রং তুলির দিয়ে সুরের ছড়া,স্পর্শ করে পৃথিবীর সব তারা। মনের অন্তরে বাজে নীরব গীত,প্রকৃতির মাঝে ছড়ায় একটি ছড়া।

বর্ষ-১২, সংখ্যা: ২ | AANANDA AANGAN | এপ্রিল, ২০২৫

চিত্রের জাদুকর যামিনী রায়

যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২) ছিলেন একজন বাঙালি চিত্রশিল্পী, যিনি বাংলার লোকশিল্পের, বিশেষ করে কালীঘাট পটচিত্রের, একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসেবে পরিচিত। তিনি গ্রামীণ জীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি তাঁর চিত্রকর্মগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

যামিনী রায় ১৮৮৭ সালের ১১ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, কলকাতা থেকে চিত্রকলায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

তাঁর চিত্রকর্মগুলিতে লোকশিল্পের ঐতিহ্য, বিশেষ করে কালীঘাট পটচিত্রের প্রভাব স্পষ্ট। তিনি গ্রাম্য জীবন, লোকনৃত্য, এবং পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে তাঁর চিত্রগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

যামিনী রায় লোকশিল্পকে আধুনিক শিল্পকলার সাথে মেলানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং ভারতীয় লোকশিল্পের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

তাঁর চিত্রকর্মগুলি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করে এবং তিনি ১৯৩৪ সালে ভাইসরয় পদক এবং ১৯৫৪ সালে পদ্মভূষণ খেতাব লাভ করেন।

তিনি নিজেকে 'পটুয়া' হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন, যা তাঁর লোকশিল্পের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রমাণ।

যামিনী রায় ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল কলকাতায় মারা যান। যামিনী রায়ের কাজের মধ্যে তাঁর নিজস্ব শৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। তাঁর চিত্রকর্মগুলি ভারতীয় লোকশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আজও মানুষের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

15 APRIL
বিশ্ব শিল্পকলা দিবস
WORLD ART DAY

শৈল্পিক সৃষ্টি এবং সমাজের মধ্যে সংযোগগুলিকে শক্তিশালী করতে, শৈল্পিক অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য সম্পর্কে বৃহত্তর সচেতনতাকে উৎসাহিত করতে এবং শাশ্বত তথা চিরন্তন উন্নয়নে শিল্পীদের অবদান তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ১৫ এপ্রিল বিশ্ব শিল্পকলা দিবস পালন করা হয়। ইতালীয় রেনেসাঁসের কালজয়ী চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জন্মদিন ১৫ এপ্রিল। মহান এই শিল্পী বিশ্বশান্তি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ব এবং বহুসংস্কৃতির পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্পের গুরুত্বের অবদানে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাকে যথোপযুক্ত সম্মান জানাতেই ১৫ই এপ্রিল তারিখটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।

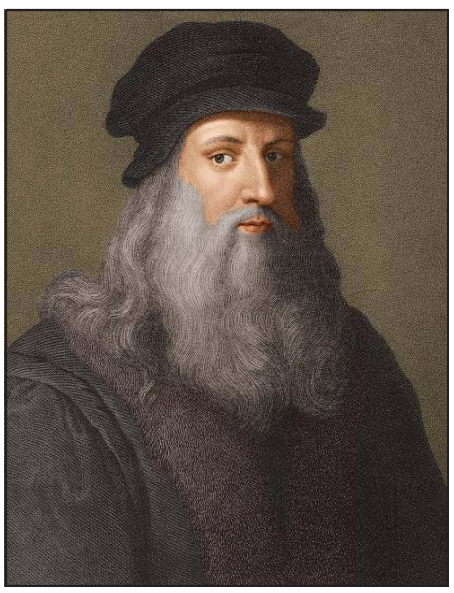

বাংলা নববর্ষ

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার : পয়লা বৈশাখ নববর্ষ (Nabo Barsho) নামেও পরিচিত। বাংলা নববর্ষ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পাশাপাশি সারা বিশ্বের বাঙালিদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। উৎসবটি বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিকে চিহ্নিত করে, যা সাধারণত প্রতি বছর এপ্রিলের ১৪ বা ১৫ তারিখে পড়ে। 'পয়লা' শব্দের অর্থ 'প্রথম' এবং বৈশাখ' বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস। পয়লা বৈশাখের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল যুগ থেকে শুরু হয় বলে মনে করা হয়, যখন সম্রাট আকবর (Mughal Emperor Akbar) ফসল কাটার মরশুমের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন কর ব্যবস্থা চালু করেন। এটি বাংলা নববর্ষের সঙ্গে মিলে যায়, যা ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় জনগণের দ্বারা উদযাপন করা হয়।

আকবর মুঘল ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন, যা ছিল ইসলামি ও হিন্দু ক্যালেন্ডারের সমন্বয়। বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে আর্থিক বছর মিলিয়ে দেওয়ার আকবরের সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে উৎসবে পরিণত হয়। প্রথমে আকবরের পঞ্জিকার নাম ছিল 'তারিখ-এ-এলাহি'। এই পঞ্জিকায় মাসগুলো ছিল আর্বাদিন, কার্দিন, বিসুয়া, তীর এমন নামে। সেটিই পরবর্তীতে বাংলায় বঙ্গাব্দ রূপে চালু হয়। আকবরের এই 'তারিখ ইলাহি'র প্রবর্তনকাল ছিল ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মার্চ। তবে ঠিক কখন যে এই নাম পরিবর্তন হয়ে বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ হল তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। মনে করা হয় বাংলা বারো মাসের নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে। যেমন বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাড়া নক্ষত্র থেকে আষাঢ়, শ্রবনা নক্ষত্র থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, মৃগশিরা থেকে অগ্রহায়ণ, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন ও চিত্রা থেকে চৈত্র। বিশাখা নক্ষত্র অনুসারে বৈশাখ বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস, সেই হিসেবে বৈশাখের প্রথমদিন নববর্ষ অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ ধরা হয়।

শিল্পকলা ও প্রকৃতি

শিল্পকলা ও প্রকৃতির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শিল্পীরা প্রায়শই প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হন এবং তাদের কাজের মাধ্যমে প্রকৃতির সৌন্দর্য, জটিলতা, এবং বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রকৃতি শিল্পের জন্য একটি বিশাল উৎস, যা শিল্পীদের আবেগ, ধারণা, এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

শিল্প ও প্রকৃতির মধ্যে এই সম্পর্ককে আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রকাশ:

শিল্পীরা ছবি, ভাস্কর্য, সাহিত্য, বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যেমন, কোনো শিল্পী একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারে, বা কোনো ভাস্কর প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে একটি ভাস্কর্য তৈরি করতে পারে।

প্রকৃতির প্রতি আবেগ:

শিল্পকলা মানুষের প্রকৃতির প্রতি আবেগ এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। শিল্পীরা প্রকৃতির প্রতি তাদের ভালোবাসা, দুঃখ, বা অন্য কোনো আবেগ তাদের কাজে প্রকাশ করতে পারেন।

প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা:

শিল্পকলা মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা তৈরি করতে পারে। শিল্পীরা তাদের কাজের মাধ্যমে প্রকৃতির গুরুত্ব এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে পারেন।

প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক:

শিল্পকলা মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করতে পারে। শিল্পীরা প্রকৃতির বিভিন্ন দিক তাদের কাজে তুলে ধরে, যা মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আরও বেশি আগ্রহ তৈরি করে।

শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতিকে বোঝা:

শিল্পকলা মানুষকে প্রকৃতিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। শিল্পীরা তাদের কাজের মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং প্রক্রিয়া তুলে ধরেন, যা মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আরও বেশি জ্ঞান এবং সচেতনতা তৈরি করতে পারে।

প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণা:

শিল্পীরা প্রায়শই প্রকৃতি থেকে তাদের কাজের জন্য অনুপ্রেরণা খুঁজে পান। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন - রং, আকার, শব্দ, বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য তাদের কাজে ব্যবহার করে।

শিল্প এবং প্রকৃতির এই সম্পর্ক শুধুমাত্র দৃশ্য বা দৃশ্যমান নয়, এটি আবেগ, ধারণা, এবং অভিজ্ঞতারও একটি মাধ্যম। শিল্পীরা তাদের কাজের মাধ্যমে প্রকৃতিকে একটি নতুন রূপে প্রকাশ করতে পারেন, যা মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আরও বেশি আগ্রহ এবং সম্মান তৈরি করতে পারে।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

নববর্ষ

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে অন্যতম হল পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখের শুভদিনটি মাঙ্গলিক আচার-আচরণের মাধ্যমে আর আনন্দপূর্ণ পরিবেশে, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন করা বাঙালির সমাজ জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পয়লা বৈশাখ বাঙালিদের কাছে মূলত পূজা প্রধান দিন যদিও নয়, তবুও উৎসব, আনন্দ, শুভকামনা, খাওয়া-দাওয়া, গদৃহসজ্জা, নতুন বস্ত্র ধারণ প্রভৃতির সঙ্গে শুরু হওয়া বছরের প্রতিটি দিন যেন সুন্দর, শান্তিময় হয়ে ওঠে। কোনও শোক ও বিপদের মুখোমুখি যেন না হতে হয়। পয়লা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের এক উৎসব। বাংলা বছরের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটি বাঙালিরা নববর্ষ হিসেবে পালন করে থাকে। বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ এই দিনটিকে বরণ করে নেয়। আপন করে নেয়, ভুলে যাবার চেষ্টা করে অতীত বছরের সকল দুঃখ, কষ্ট, ক্লানি। সবার কামনা থাকে যেন নতুন বছরটি সমৃদ্ধ ও সুখময় হয়।

নতুনের গান গাই

নীতা কবি মুখার্জী

নতুন বছর এসেছে দুয়ারে নতুন আশায় ভরো,
নব আনন্দে মিলনের সুরে ঐক্যের গান ধরো।
নব বৈশাখের এই শুভক্ষণে
দুঃখ দারিদ্র্য দূর হয়ে যাক,
মলিনতা আর আবর্জনার স্তূপে মেরুদন্ডগুলো সোজা হয়ে দাঁড়াক।
প্রদূষণে ভরা পৃথিবীটাকে দূষণমুক্ত করবো আমরা,
সকলে হাসবো, নাচবো গাইবো, বিজয়ী হবে সর্বহারা।
অন্যায় সয়ে বাঁচার চেয়ে লড়াই করে মরা ভালো, ভাই!
মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্যে হাতিয়ার উঁচিয়ে দাঁড়াবো সবাই।
হালখাতা আর গাজন মেলায় চড়কপূজার কোলাহল যত,
নতুন জামার নতুন গন্ধে বাঙালির মন মাতবে তত।
মাংস,পোলাও, গলদা,চিংড়ি, বাজার যাবেন কর্তাবাবু,
সূর্যিমামার দোর্দণ্ড প্রতাপে ত্রাহি ত্রাহি রবে সবাই কাবু।
দোকানে দোকানে পূজোর প্রসাদ, মা গন্ধেশ্বরীর শুভ আবির্ভাব,
নতুন বছর খুশীতে ভরুক, থাকে না যেন কোনোই অভাব।
নিজেকে নিয়ে বিব্রত হতে আসি নাই এই সংসার মাঝে,
সকলের জন্য, সবার পাশে থাকবো আমরা সবার কাজে।

হয়তো ছিল

পার্বতী ভট্টাচার্য

হয়তো ছিল অঙ্গীকার,
হয়তো বা কিছু দায়বদ্ধতা।
আজ আর কিছুই
মনে নেই তা।
জীবন খাতার কিছু পাতায়
হয়তো কিছু আঁকি বুকি কাটা হলো,
বাকি রয়ে গেল
অনেক সাদা পাতা।
অনেক না বলা কথা
বলাই হলোনা,
থাকনা তারা শুধু ই আমার হয়ে
আমার মনের চোরা কুঠুরিতে।
থাক না আমার সাদা খাতার পাতা,
আমার হয়ে আমার সত্যি কবিতা।

সনেট

গোবিন্দ কুমার মন্ডল

আষাঢ় শ্রাবণ নামে ধারাপাত লয়ে
ধরা তলে, রুক্ষ, তাপিত বক্ষে তারি
অমৃত সুধা ঢালি প্রাণ শীতলয়ে।
তৃষিত প্রাণিকুল লভে তৃষ্ণার বারি
তরুবর বাঁচে, সবুজ বনানী সয়ে
ক্ষীণ কায়া তরঙ্গিনী দুকূল প্রসারী
সাগরের পানে চলে স্রোতস্বিনী হয়ে,
স্বপ্নভরা চোখে চাষী চলে সারি সারি।

বাংলার নদী খাল এমনি ভরিত,
গাঙ্গুরের জলে ভেসেছিল বেহুলা,
চাঁদের তরণী, নিশাভিসারে ভুলিত
পথ, বিরোহিনী রাই পরান উতলা,
সবুজ ধানের ক্ষেত, হাওয়ায় দুলিত
সেদিনও বর্ষা-স্নাত অপরূপা বাংলা।

আমাদের পঁচিশে বৈশাখ

সুশীল মণ্ডল

আমাদের পঁচিশে বৈশাখের স্বাভাবিক নিয়মে
ধাবমান হওয়ার কথা
ফুল মালঞ্চের গন্ধডালির দিকে।
কত সময় গড়িয়ে গেল
অথছ তোমাকে টের পাওয়া যাচ্ছে না
চৈত্রের শেষ সন্ধ্যায়।

এ কথা আমরা জানি
কোপাইয়ের জলে স্নান সেরে
আমাদের চির নতুন পঁচিশে বৈশাখ
কাঞ্চন ফুলের গন্ধ মাখাবে
ছাতিম গাছের সারা শরীরে।

গীতাঞ্জলির কাব্য মোহানায় কত বলাকা উড়বে
আকাশে ফুটবে অযুত নিযুত তারা
বাংলার গভীর রুপে ধৌত হয়ে
ওগো আমাদের পঁচিশে বৈশাখ
তোমারতো আসার কথা আমাদের
অহঙ্কারহীন মাটির পথে।
ওহে পঁচিশে বৈশাখ
এখন ও কেন তুমি থমকে দাঁড়িয়ে আছো অশ্রুনদীর ওপারে!

বাংলার প্রতিমা: বারমাস্যা

চিন্ময় গুহ ঠাকুরতা

বৈশাখে সেই পরিচিত মুখরেখা
খররৌদ্রের উত্তাপে উজ্জ্বল,
জ্যৈষ্ঠ আকাশে তাকে মনে হয় একা
আষাঢ়-শ্রাবণে নববর্ষার জল
ছায়া ফেলে মনে, নদীস্রোত ভাঙে মাটি
ভরা ভাদ্র ও আশ্বিনে নামে ঢল
আমার স্বপ্ন বাংলার প্রতিমাটি
কার্তিকে হিম নিশির শিশিরে দেখা।

অঘ্রাণ মাসে সজীব ধানের গন্ধ
পৌষে উড়ুক উদ্বেল যত স্মৃতি
মাঘ-ফাগুনের দুয়ার জানালা বন্ধ
শুধু মনে পড়ে কবিতার উদ্ধৃতি,
পলাতক কিছু হৃদয়-বিদারী ছন্দ।
চৈত্রদিনের শেষ বিকেলের পাখি
কেন যে সহসা হয়ে ওঠে উৎসুক,
ঈশান আকাশে ঝড়, কালবৈশাখী
আগুনের শিখা ঢাকে বাংলার মুখ;

উন্মাদ ক্রোধে আগুনেই হাত রাখি।

বৈশাখী কবিতা

কবি প্রজ্ঞা পারিজাত

বৈশাখী দিনে
লিখতে বসে কবিতা,
দেখি সময়ের চোরাস্রোতে
সবুজ গেছে হারিয়ে,
প্রেমের বদলে রুক্ষতা হয়েছে বলবান,
জলাশয় ভরাট হয়েছে নিত্য দিনের খবর
বৈশাখী দিনে শীতল বাতাস
গেছে দূরে সরে;
সময়ের ইতিহাসে - মেকি সভ্যতায়,
ওজন স্তর ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে;
সময়ের কথা - মানুষের কথা
লিখতে বসে বিষন্ন দুপুরে বৈশাখী দিনে,
বয়ে চলে দুঃখস্রোত অন্তরে ,
আমি দেখি মেকি সভ্যতা কেড়ে
নিচ্ছে মানুষের শ্বাস - প্রশ্বাস;
বৈশাখী দিনে বৈশাখী সমীরণ
নিয়েছে বিদায়;
আমরা বানাবো মানুষের সমাধি মন্দির সযতনে ।।

নতুন বছরে, বাংলায়

গৌতম সরকার

গাছে গাছে কিশলয়
কোকিলের ডাক।
চড়কের দিন গেলে
আসে বৈশাখ।।

বাংলায় শুরু হয়
নতুন বছর।
নতুনে সাজাতে চায়
সব ঘরদোর।।

সাজো সাজো রব ওঠে
সারা বাংলায়।
প্রকৃতিও সেজে ওঠে
তার সে ধারায়।।

পুরোনো মলিন যত
সব ফেলে দিয়ে।
নতুন বছর আসে
নব রূপ নিয়ে।।

ঘুঘু ডাকে বন শাখে
ঘুঘুর ঘুঘুর।
গ্রীষ্মের আবেশেতে
বড়ই মধুর।।

বৈশাখ শুরু হয়
দিন পয়লায়।
আনন্দ উৎসবে
এই বাংলায়।।

সব মন বলে ওঠে
সুখ শুধু থাক।
কষ্টের দিনগুলো
দূর হয়ে যাক।।

এই ভাবে আসে ওই
নতুন বছর।
আনন্দে মন গুলো
থাকে যে বিভোর।।

তন্দ্রা

অর্পিতা ঘোষ পালিত

খালি পকেট, ক্ষুধার্ত পেট
দহন প্রান্তরে শকুনের মিছিল হাঁটে
সুখের কারবার করতে রোদমাখা সকালের
বিজ্ঞাপন
লোলুপ ভাষা না বুঝে
প্রলোভন গায়ে মেখে
ছুঁড়ে দেওয়া উচ্ছিষ্ট পেয়ে আপ্লুত
আত্মতৃপ্তিতে ঘুমায়
এ ধারাবাহিকতা জন্ম-প্রজন্ম ধরে চলছে
মনুষ্যত্বের কৈফিয়ত কেউ চায়না
কেননা ঘুম ভাঙেনা কারোর...।

সুন্দরবন

ভবতোষ গায়েন

সকাল হতে বাতাস বয়
কাঁপে সুন্দরবন
হাজার রকম ফুলের গন্ধে
নেচে ওঠে মন।
নেই এখানে সিলিং ফ্যান
আছে মিষ্টি বায়ু
তাতেই মানুষ খুঁজে পায়
জীবনের বৃহৎ আয়ু।
বনে আছে বাঘ - বাঘিনী
হরিণী হাজার হাজার
গাছের ডালে বাঁদর যত
বসায় নিত্য বাজার।
দূরের মানুষ আসে হেথা
দেখতে সুন্দরবন
ছলাৎ ছলাৎ নদী দেখে
ভরায় তাদের মন।
কত মানুষ হারিয়ে যায়
কাটতে গিয়ে কাঠ
মধু পেতে প্রাণ যায়
শূণ্য হয় হাট।

আমার রবিঠাকুর

অরুণিমা ভট্টাচার্য

আমার মনের প্রতিটি কোণায় সদাই তুমি করেছো বাস,
মন খারাপের দিনে তোমার সৃষ্টি জোগায় বাঁচার আশ্বাস।

এক সাধারণ মেয়ের মনের আঙ্গিনায় রয়েছে তোমার ঠাঁই,
সকল দুয়ার বন্ধ হলেও তোমার কাছে আশ্রয় পাই।

জীবনের সকল ওঠাপড়ায় তোমাকেই করি অনুসরণ,
আমার সৃষ্টির প্রেরণা তুমি,তোমাতেই করি সমাপণ।

আজও তোমার সব সৃষ্টি পড়তে পারিনি আমি,
অন্তরের গভীরতায় আছো তুমি, আমার অন্তর্যামী।

এই কৃত্রিম পৃথিবীর প্রকৃত বন্ধু তুমি ,ভরসার আশ্রয়
একলা পথ চলতে শেখাও,আঁধার শেষে আলো দেখাও রবীন্দ্রনাথ।

তোমার স্পর্শে শব্দের খেলা, সাহিত্যের জন্ম হয়,
তোমার সুরেতে গান মোহময় দর্শন ও প্রাণ পায়।

দুই বাংলার জাতীয় সঙ্গীত তোমার চিরঅমর রচনা,
যা আজও আমাদের পূজ্য, আমাদের ভক্তি বন্দনা।

তুমি ভোরের, তুমি দুপুরের , তুমি প্রতিক্ষণের রবি,
আজও বিশ্বের প্রতিটি ঘরে থাকে তোমার ছবি।

তোমার অক্ষয়কীর্তি বিরাজিত আজও সকলের অন্তরে,
হৃদয় আসনে পূজিত হবে চিরকালীন জন্মান্তরে।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ তুমি, শ্রেষ্ঠ তোমার সকল কাজ,
যেখানে থেকো ভালো থেকো বিশ্বসেরা রবীন্দ্রনাথ।।

বৈশাখী আবাহন

হরিহর বৈদ্য

বৈশাখী মনে চঞ্চল মাদকতা
নূতনের ডাকে পরানটা উৎসুক,
মনের দুয়ারে কে যেন ডাকিয়া কয়
অভিসারী প্রেমে ভরে ওঠে তার বুক।

পলাশের ঠোঁটে হাসি ভরা রোদ্দুর
রঙিন আবির মেখেছে কৃষ্ণচূড়া,
কিশোরী পরানে ভীরু আবেশের দোলা
কার দর্শনে প্রাণ করে তাড়াহুড়া!

শুষ্ক পৃথিবী অধীর অপেক্ষায়
দুপুরের মুখে স্তব্ধ নীরবতা,
সন্ধ্যা বাতাস মাতাল আবেশ এনে
ওড়ালো অতীত জীর্ণ ঝরা পাতা।

খাল ভরেছে বেগুনি পানা ফুলে
মাঠে মাঠে হাসে হলুদ সূর্যমুখী,
আদিবাসী নাচ নতুন ছন্দে মাতে
মাদলের তাল ছড়িয়ে দিচ্ছে খুশী।

আগমনী গানে আগামীর নেশা জাগে
তাই বাঙালির মন শান্তির নিকেতন,
বৈশাখী প্রাণ গোষ্ঠ, চরকে মাতে
আজ এক হয়ে গেছে ধনী আর নির্ধারণ।

আলো আমার আলো

আশিষ হাজরা

এ জগতের সভায় তুমি
সামান্য হয়ে আসনি প্রিয়
এ জগতেরই মাঝে তুমি
নিজ পরিচয় খুঁজে নিও।।

গহন রাতের গহীন তারা
তুমিতো সেই রজনীগন্ধা
তুমিইতো আলো,অন্ধকারে
তুমিই প্রভাত তুমিই সন্ধ্যা।।

জনমের ক্ষনে যে বাঁশি বাজে
মনেতে সেই সুর অহরাত্রি
সকল আঁধার ঢেকেছো প্রিয়
তুমি যে আলোর যাত্রী।।

নতুন বছর

রিয়াদ হায়দার

নতুন বছর জ্বলুক আলো সকল প্রাণে,
ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ুক ছন্দ গানে !
জীবন থেকে যাকনা মুছে সকল কালো,
নতুন বছর হৃদয়ে থাক খুশির আলো !
হিংসা বিবাদ দ্বন্দ ভুলে থাকবো মিলে,
সম্প্রীতি আজ মেলুক ডানা আকাশ নীলে !
নতুন বছর পাখির শিসে আলো ফুটুক,
পূব আকাশে নতুন করে সূর্য উঠুক !
গাছের পাতায় রামধনু রঙ আবির মাখুক,
কর্মে জীবন জুড়ে মানুষ ভালো থাকুক !
বিশ্ব জাহান আলোয় ভরে নতুন বছর আসুক,
অতীত স্মৃতি ভুলে সবার আনন্দে মন ভাসুক !

নববর্ষের ছন্দপতন

শমী তরফদার

বাংলা নববর্ষ পুরাতনী বেশ ছেড়েছে ,
কিছু বছর আগে থেকেই।
নিজস্ব এক নতুন ঘরানা নিয়েছে -
কোথাও যেন ছন্দপতন!
আগের রূপে তেমন করে আসেনা
স্মৃতির পাতা ওল্টালেই দেখি
প্রভাতে নতুন রবি, তেমন হাসি হাসে না
সদর দুয়ার পথে অগ্নিসংযোগ ঘটে না।
নিম হলুদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে,
'বাঙালিয়ানার ভাবে' নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

নববর্ষ আজ তাই-
বাঙালিয়ানা দেখানোর উৎসব।
নতুন বছরে নতুন জামার গন্ধ
আলাদা করে ধরা দেয়না ঘ্রাণে।
যা কিছু ভালো সবটুকু করে ফেলার
তাগিদ নেই আজ আর।
শুধু মুঠো ফোনে বন্দী কিছু মুহূর্ত ;
শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখে বছর শুরুর
বাঙালিয়ানার এই উৎসবকে -
স্মৃতির পাতা তাই ধূলায় ধূসর।

ট্রেন ফেল

ভৃগুরাম হালদার

আমি বনানী, প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে কিছু কাজ করি। বিশেষ কাজ সেরে গঙ্গাসাগর থেকে ফিরছি। কাকদ্বীপ থেকে ট্রেন ধরে কলকাতায় আসব। লঞ্চ ঘাট থেকে টোটো চেপে আসতে গিয়ে ট্রেন ফেল, কয়েক মিনিটের জন্য ট্রেনটা ধরা গেল না।

টিকিট কাউন্টারে টিকিট কেটে ফিরছি দেখি পাশে এক শীর্ণকায় মহিলা, কোলে একটি বাচ্চা নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে বলে, 'কিছু দেবেন, দেন না কয়টা টাকা'। অস্বস্তি এড়াতে পাঁচ টাকার একটা কয়েন হাতে দিলাম। দেখলাম মহিলার বয়স বড়জোর ২৪ কি ২৫, শ্যামলা রং মুখশ্রী মানানসই, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, খালি পা, ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, ব্লাউজের বালাই নেই। বুকের মধ্যে উষ্ণতা খুঁজে মুখ লুকিয়ে আছে বছর খানেকের বাচ্চা, কঞ্চির মত দুটো লিকলিকে পা দুলছে, সঙ্গে আরো তিনটে বাচ্চা একটা হুলো কুকুরের পাশে ঘুমোচ্ছে। অন্যরা দাঁড়িয়ে যাত্রীদের দেখে দৌড়ে গিয়ে পয়সা চাইছে। কেউ দিচ্ছে, কেউ ঘুরেও তাকাচ্ছে না। বড়টার বয়স আট বছর হবে। মহিলাকে দেখে বোঝা যায় রূপের ঝলক এ বয়সে যা থাকার তা পুষ্টি ও যত্নের অভাবে মলিন। হঠাৎ মনে হল চার সন্তানের মা পেটে আরো একটাকে আলো দেখানোর অপেক্ষায় — এ কোন যুগে আছি আমরা?

ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে ঢক ঢক করে গলা ভিজিয়ে এগিয়ে দূরে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। পরের ট্রেন আসতে তখন অনেক বাকী, স্টেশনে তেমন লোক নেই। খিদেও পাচ্ছে- একটা দোকান থেকে কেক নিয়ে দু কামড় দিয়েছি, একটা বাচ্চা কাছে এসে মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, হাতটা বাড়িয়ে কিছু চাইছে।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ৮-৯ বছরের সেই বাচ্চা মেয়েটি, ভাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। ঐটুকু জীবন খিদের জ্বালা সয় কিভাবে? কষ্ট হল ওদের দেখে। এঁটো কেকটা দিতে মন চাইলনা। দুটো কেক নিয়ে ওদের দিলাম, সঙ্গে জলের বোতল- আর দশ টাকাও দিলাম ওদের। খুশীভরা চোখ দুটো দেখে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের বাড়ী কোথায়? তোমার বাবা মা কই?

কেকের প্লাস্টিকটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে মেয়েটা বলে, আমরা কুলপি ইস্টিশনের ধারে রামিজ চাচার বারান্দায় থাকি। আমার মা সানজিদা - আব্বা তিন বছর আগে মা'রে তালাক দে কোথায় চলে গেছে জানিনা!

বাচ্চা দুটো কেকটা নিয়ে মার দিকে চলে গেল, হয়ত ছোট ভাইকে দিতে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম, ব্যাপারটা কি বুঝতে।

দেখি সেই মহিলা ঐটুকু কেক কেটে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে আর নিজে নিল দু ঢোক জল।

হঠাৎ বড় মেয়েটি আমায় দেখে বলে মা উনি কেক কিনে দিল। মহিলা বলল, আপনাদের মত মানুষের দয়ায় আমরা বেঁচে আছি, নইলে-

জানতে চাইলাম - আগে কোথায় থাকতে?

জানাল ঘোড়ামারা দ্বীপে, গতবারের বন্যায় ঘরবাড়ী ভেঙে নদীতে চলে গেল, আয়েশার বাপটা বাইরে আলুস্টোরে কাজে গে আর একটা নিকে করে নেল। আমি বলতি গেলে মেরে দূর করে দিল ঘর থেকে, তাতেও শান্তি হয় নে, শেষে তালাক দিল, বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

এই ছাবালগুলো নে আমি কোথায় যাই, বাপ কুলে কেউ ঠাঁই দেলনি। দূর সম্পর্কের এক চাচার বাড়ির গোয়ালের পাশে ভাঙা বারান্দায় পড়ে থাকি রাতটুকু - সকাল হলে ছালা মনি দের হাত ধারে ইস্টিশনে ভিক্ষে করি।

ওর আব্বা এখন কোথায়, দেখা হয়?

না, জানিনা, নতুন শাদি করে শহরের দিকে চলে গেছে।

তাহলে- পেটেরটা কি?

লজ্জায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, মাথা নিচু করে বলে -

প্রথম প্রথম সারাদিন এর বাড়ি কড়াই তোলা, ওর বাড়ি ধান সেদ্ধ করার কাজ কাজ করতুম। লোকে আমায় দুটো খেতে দিত। একজনের বাড়িতে বাসন মাজা, মাঠের কাজ, ঘরের কাজ সব করতুম। তাদের সেজ ছেলের নজর খারাপ। রাত হলে আমার কাছে আসত - যদি বলে দিই তাহলে খেতে দেবেনে- থাকতে দেবেনে, ভয় দেখায় মারত, খুব মারত। ছেলেমেয়েদের দূর দূর করত, কুকুরের মত ব্যবহার করত, কি বলব! আর সহ্য করতে না পেরে ওদের হাত ধরে রাস্তায় নেমেছি এখন আল্লা ভরসা।

বলছি হাসপাতালে গিয়ে একটা ব্যবস্থা —

তোবা তোবা! কন কি? গুনা হবে যে। খালাস করা ধর্মে নেই।

আমার অবাক লাগে শুনে, চুপ করে থাকি। সে আরো বলে -

আমি কিন্তু হিন্দুর মেয়ে ছিলাম, নাম ছিল সঞ্চিতা, ওর বাপ জোর করে আমায় নিকে করে নাম দেয় সানজিদা, ছোটবেলায় ঠাকুর ধর্মে খুব বিশ্বাস ছিল, কি যে কপাল-আমার এখন না ঘরের না ঘাটের।

কতবার মরতে গেছি, কিন্তু এই এদের মুখের দিকে চেয়ে পারিনি -

ভাবি সবকটারে নে ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দি — কিন্তু, আমি যে মা- ওদের দোষ কি! পেটে ধরেচি তাই নাড়ির টান - তাইতো আমরা মা - আমি এখন মোছলমানী মা- কেউ না কেউ ওদের দয়া করবে। আল্লার দোয়ায় তোমাদের মত কেউ আসবে। মেহেরবানি করলে ওরা বেঁচে যায়। ওদের দোষ কোথায়?

ঐ মদ্দ জাতটার যত দোষ, ওদের জন্য আমাদের মত গরীর ঘরের মেয়েদের এমন দশা।

এতগুলো কথা এক নাগাড়ে বলে হাঁপিয়ে ওঠে সে — সানজিদা না সঞ্চিতা!

আমি অবাক হয়ে, মনে মনে বলি - হ্যাঁ- তুমি মা বটে, মায়ের জাতটাই এমন হয়।

বিধাতা কতটা শক্তি, ধৈর্য, সহ্যক্ষমতা দিয়ে এদের পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে, এদের জীবন যন্ত্রণার খবর সভ্য সমাজের কজন জানে!

একটা ট্রেন মিস করে এক মায়ের অযাচিত জীবন আঁকুতি দেখলাম তা আমাকে নাড়িয়ে দিল।

একটা ট্রেন ফেল বুঝিয়ে দিল মা হওয়া কত যন্ত্রণার!

অন্তরালে

সুপর্ণা পাল বণিক

আজ কাল কবিতা লিখতে চাইলেও লিখতে পারি না

সুখের একান্ত নিজস্ব মাস্তুলে
শব্দ অক্ষর গুলো কেমন যেনো পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়
যেনো লেগেছে শোক।

আমি ভাব নিয়ে শুরু করি
অবিরাম পাক খাওয়া ভাবনা গুলো নিয়ে বসি
ছুঁতে চাই কিনারা

অথচ দ্বিতীয় সারিতে এসে ,
সময়ের বাগিচায়-
অবাধ্য কথা গুলো কেমন যেনো
হুস হুস করে উড়ে যায়।
বালুচরে পড়ে থাকে কিছু সাদা স্মৃতি।

ভয় হয়।
কেঁপে কেঁপে উঠি বারবার।
জমাট বাঁধে কি তবে পাথরের অস্তিত্ব অন্তরালে!!

নৌকাডুবি বোধ হয় এভাবেই হয়.....

একজন ছাত্রের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি শিল্পকলা এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

সৌমিলি পাঁজা, শিল্পাঙ্গন আর্ট স্কুল

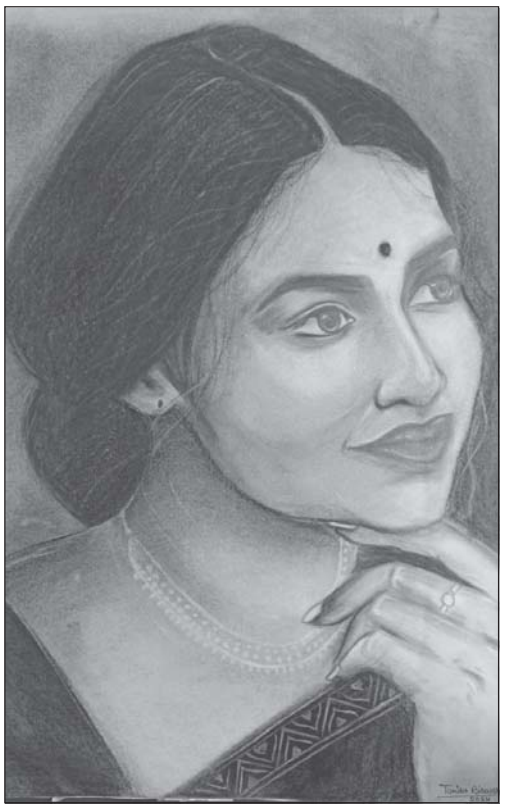

তানিশা বিশ্বাস, প্রান্তিক আর্ট সেন্টার

সৌনক সরকার, বাঙ্গালোর, কর্ণাটক

সুকন্যা সেন, নবদীপ শিল্পাঙ্কন আর্ট

অপরাধীদের শিল্পচর্চা-১

রতনদের আঁকা ল্যান্ডস্কেপ দেখে কে বলবে ওরা খুনী ?

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত সংখ্যার পর

বাড়িতে মা, ঠাকুমা আছে। ওদের বয়স হয়েছে। ঠাকুমার তো আশি পেরিয়ে গেছে। রতনের আকা ছবি বাড়িতে পাঠিয়েছিল দেখার জন্য। মা খুব খুশি। রতন অপেক্ষা করছে কবে মেয়াদ শেষ হবে, কবে মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঠবে! এর অন্ধকার জীবনে আবার আলো ফুটবে! আর এমনি ছবিই কি ও একে চলেছে ?

জীবনকৃষ্ণের জীবন-কথন

সুন্দরবন এলাকার ছোট্ট দ্বীপের মত একটা গ্রাম। গ্রামের নাম কুমীরমারি। জীবনকৃষ্ণ সেখানকার মানুষ। নদী-নালা আর গাছ-গাছালি, সবুজের মধ্যে বড় হয়েছে জীবনকৃষ্ণ। চার ভাইয়ের এ-ই ছোট। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। তারপর পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সময়মত স্কুলে যাওয়া হত না প্রতিদিন। আর বাড়িতে পড়াশুনার পাটও ছিল না।

জীবনরা ছিল ঐ এলাকার বর্ধিষ্ণু চাষী পরিবার। জমির ফসল যা উঠত তাতে সারা বছর চলে যেত। সচ্ছল অবস্থা। আর তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে একটু মন কষাকষিও ছিল। গ্রাম্য পলিটিক্স। চাষের কাজ যখন থাকত না তখন সময় কাটানোর জন্যই মাটির মূর্তি তৈরি করত। জীবন যখন আরও বড় হল, বিয়ে হল। দুটো মেয়েও হল। সারা বছর চাষের মধ্যে না থেকে মাছের ব্যবসা শুরু করল। ঐ এলাকার চালু ব্যবসা ওটা।

বাবা, মা, চার ভাই, তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে এক বিরাট যৌথ পরিবার। বউ আর মেয়েদের নিয়ে জীবনের সংসার-জীবন বেশ শান্তিতেই চলে যাচ্ছিল।

জীবন এখন জেলের মধ্যে মানুষের ছবি আঁকতে ভালবাসে। শিল্পীর ভাষায় যাকে বলা হয় 'পোট্রেট'। এখন আঁকছে স্বামী- স্ত্রী'র একটা ছবি।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ছবি একেছে। ওর খুব ভাল লাগে শরৎচন্দ্রের লেখা। নেতাজীর ছবিও একেছে। আরও কত মানুষের মুখ উঁকি মারে ওর ছবির মধ্যে। ওকে জিগ্যেস করেছিলাম— আপনার বাবা-মা'র ছবি আঁকবেন না?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও জবাব দিল মা'র ছবি আকব। মা মারা যাওয়ার দিন শ্মশানে দাহ করার সময় থেকেই কথাটা ভেবে রেখেছি। মেয়াদ শেষ হলে বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্তে মা-র একখানা ছবি আঁকব।' প্রশ্ন করলাম 'বাবার ছবি আকবেন না ?' ও জবাব দিল-'না' ওর চোখে ফুটে উঠল ঘৃণা। আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে ও হঠাৎ বলে উঠল, কেন আঁকব না, সে কথা, আপনাকে বলব না।

এরপর পরবর্তী সংখ্যায়

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
ঘোলা, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১১
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ
বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।
সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com